গল্প

কাশীনাথ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাশীনাথ

এক

রাত্রি চারটার সময় স্নানান্তে পূজাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া টিকিটি বেশ উঁচু করিয়া বাঁধিয়া কাশীনাথ যখন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের টোল-ঘরের বারান্দায় বসিয়া দর্শনের সূত্র ও ভাষ্য গুনগুন স্বরে কণ্ঠস্থ করিত, তখন তাহার বাহ্য-জগতের কথা আর মনে থাকিত না। প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘাকৃতি কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শন-শাস্ত্র-গহনে প্রবেশ করিয়া আপনাকে দিশেহারা করিয়া ফেলিত। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া কত লোক কত কথা বলিত। কেহ কহিত, সে তাহার পিতার ন্যায় পণ্ডিত হইবে। কেহ বলিত, পিতার ন্যায় পড়িয়া পড়িয়া হয়ত বা পাগল হইয়া যাইবে। যাঁহারা তাহার বাতুল হইবার আশঙ্কা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কাশীনাথের মাতুল একজন। তিনি মধ্যে মধ্যে বলিতেন, বাপু, তুমি গরীবের ছেলে, তোমার অত পড়িয়া কি হইবে? যাহা শিখিয়াছ, তাহাতেই কোনরূপে একমুষ্ঠি আতপতণ্ডুল, একখানা গামছা ও দুটা তৈজসপত্রের স্বচ্ছন্দে যোগাড় হইবে। অত পড়িয়া কি শেষে স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া মাথা নাড়িতে থাকিবে? এখন যাহা আশা আছে, তখন তাহাও থাকিবে না। এ-সকল কথা কাশীনাথের এক কর্ণ দিয়া প্রবেশ করিত, অন্য কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া যাইত।

বাতুল হইয়া যাইবার আশঙ্কায় মাতুল তিরস্কার করিতেন; সংসারের কাজকর্ম কিছুই দেখে না বলিয়া মাতুলানী তাড়না করিতেন; ব্যাকরণ-সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ মাতুলপুত্রেরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত; কিন্তু কাশীনাথ হয় এ-সকল অকাতরে সহ্য করিত, নয় এ-সকল কথার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিত না।

যাহা হউক, ফল একই দাঁড়াইয়াছিল; সে নিত্য যাহা করিত, নিত্য তাহাই করিত। সন্ধ্যার সময় কখনও মাঠে মাঠে আপনার মনে ঘুরিয়া বেড়াইত, কখনও নদীতীরের একটা পুরাতন অশ্বত্থ-বৃক্ষের শিকড়ের উপর বসিয়া, অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভা কেমন করিয়া একটির পর একটি করিয়া আকাশের গায় মিলাইয়া যায়, দেখিতে থাকিত, কখনও গ্রামের জমিদার-বাটীর শিবমন্দিরে শিবের আরতি অর্ধনিমীলিতনেত্রে অনুভব করিতে থাকিত, কখনও বা এ-সকল কিছুই করিত না, শুধু মাতুলের চণ্ডীমণ্ডপের অন্ধকার নিভৃত কোণে কম্বলের আসন পাতিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত যেন জগতে তাহার কর্ম নাই, উদ্দেশ্য নাই, কামনা নাই। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। এখন অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে—এই ছয় বৎসর কাল মাতুলভবনে এইরূপে কাটিয়া যাইতেছে। সে এখন কি করিতেছে, পরে কি করিবে, আগে কি করিয়াছিল, এখন কি করা প্রয়োজন ও উচিৎ, এ-সব কথা তাহার মনে আদৌ স্থান পাইত না। যেন তাহার এমনই করিয়া চিরদিন কাটিবে, যেন এমনই ভাবে চিরদিন মামার বাড়ির দু'বেলা দু'মুঠো ভাত ও তিরস্কার খাইতে পাইবে। যেন তাহাকে আর কোথাও যাইতে হইবে না—আর কিছুই করিতে হইবে না। তাহার সেই নীরব নিস্তব্ধ অন্ধকার কোণটি যেন চিরদিন তাহারই অধিকারে থাকিবে, কেহ কখনও সেটা দখল করিতে আসিবে না, কিংবা সরিয়া অন্যত্র বসিতে বলিবে না। পাড়ার কোনও লোক দয়া করিয়া কখনও ডাকিয়া বলিত, কাশীনাথ, এমন করিয়া কখনও কাহারও চলে নাই, তোমারও চলিবে না; যাহা হউক, একটা কিছু কর। কাশীনাথ জবাব দিত না; শুধু মনে মনে ভাবিত, কি করিতেছি এবং কি বা আমাকে করিতে হইবে? এমনি করিয়া কাশীনাথের দিন কাটিতেছিল।

.

দুই

ও-গ্রামের জমিদারের নাম প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। প্রিয়নাথবাবু মহাকুলীন ও অতিশয় ধনবান। যখন দেখিলেন, এক কুলের খাতিরে এত বড়লোক হইয়াও

সর্বরূপগুণযুক্ত পাত্র বহু অনুসন্ধান করিয়াও মিলিল না, তখন তিনি কৌলীন্য-প্রথার উপর একেবারে চটিয়া গেলেন; গৃহিণীকে এ কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, আমার এক বৈ মেয়ে নেই, আমার আর কুল নিয়ে কি হবে?

গ্রামেই গুরুদেবের বাটী; তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, হরি, হরি—এও কি কখনও সম্ভব? তোমার অর্থের ভাবনা নাই, কোন দরিদ্র কুলীন সন্তানকে কন্যা দান করিয়া, জামাতা ও কন্যা নিজের বাটীতেই রাখিয়া দাও—ইহা দেখিতেও ভাল হইবে, শুনিতেও ভাল হইবে। এত বড় বংশ, এত বড় কূল, ইহার মর্যাদা কি ছোট করিতে আছে! প্রিয়বাবু বাড়িতে আসিয়া এ কথা জানাইলেন। গৃহিণী সাহ্লাদে মত দিয়া বলিলেন, তাই কর। যে ক'টা দিন বাঁচি, কমলা আমার কাছেই থাক।

তাহাই হইল। দরিদ্র দেখিয়া বিবাহ দিয়া নিজের কাছেই রাখিবেন বলিয়া, প্রিয়বাবু একদিবস মধুসূদন মুখুয্যে মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মধুসূদন শর্মা তখন যজমান-বাটীতে নিত্যপূজা করিতে যাইতেছিলেন। সহসা এতবড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন, কোথায় বসিতে দিবেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না।

প্রিয়বাবু বুঝিলেন, মধুসূদন কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন; হাসিয়া বলিলেন, মহাশয়ের নিকট কিছু প্রয়োজন আছে, চলুন ভিতরে গিয়ে বসি।

আজ্ঞে হাঁ—চলুন; কিন্তু—তা—

না—তা কিছুই নয়—চলুন, বসে সকল কথা বলচি।

তখন দুইজন চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। প্রিয়বাবু বলিলেন, আপনার ভাগিনেয়টি কোথায়?

আর কোথায়! ভট্টাচার্যমশায়ের টোলে পড়চে।

একবার ডেকে পাঠান।

পাঠাচ্ছি; কোনও প্রয়োজন আছে কি?

বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মধুসূদন ভট্টাচার্য কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, সে অকর্মণ্য ছোঁড়াটার সহিত এত বড় সম্ভ্রান্ত লোকের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে। বরং একটু ভীত হইয়া কহিলেন, কিছু করেচে কি?

কি করবে?

তবে?

প্রিয়বাবু হাসিয়া বলিলেন, তাকে নিজের জামাতা করব মনে করেচি এবং সেই সূত্রে আপনি আমার বৈবাহিক। বলিয়া প্রিয়বাবু জোরে হাসিয়া ফেলিলেন। যে কথা মনে হওয়ায় তাঁহার হাসি পাইয়াছিল, মধুসূদন তাহা জানিতে পারিলে বোধ হয় আর কথাই কহিতেন না। ভট্টাচার্য বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে কিছুক্ষণ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, কাকে—কাশীনাথকে?

হাঁ।

কেন?

অত বড় কুলীনসন্তান আমি আর সন্ধান করে পেলাম না। আপনার এ বিবাহে অমত আছে কি?

অমত! এ ত পরম সৌভাগ্যের কথা—কিন্তু সে যে পাগল।

পাগল? কৈ, এ কথা ত কখন শুনি নাই?

তার পিতা পাগল ছিল।

কাশীনাথের পিতাকে প্রিয়বাবু বিলক্ষণ চিনিতেন; এবং ইহাও জানিতেন, তাঁহাকে অনেকেই পাগল বলিত। প্রিয়বাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, ছেলেটির নাম কি?

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাকে ডেকে পাঠান—আমি একবার দেখব।

মধুসূদন ভট্টাচার্য তাহাকে ডাকাইতে পাঠাইলেন। যে ডাকিতে গেল, সে তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র। সে গিয়া ডাকিল, কাশীদাদা! কাশীদাদা উত্তর দিল না। আবার ডাকিল, কাশীদাদা!

এবার কাশীনাথ মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, কি?

তোমাকে বাবা ডাকচেন।

কেন?

তা জানিনে। ও-গাঁয়ের জমিদারবাবু এসেচেন, তিনিই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েচেন।

কাশীনাথ ধীরে ধীরে পুঁথি বন্ধ করিয়া বাটী আসিয়া যেখানে প্রিয়বাবু ও তাহার মাতুল মহাশয় বসিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপবেশন করিল।

প্রিয়বাবু তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, কাশীনাথ! কোথায় ছিলে?

ভট্টাচার্য মহাশয়ের টোলে পড়ছিলাম।

ব্যাকরণ পড়েচ?

কাশীনাথ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে পড়িয়াছে।

সাহিত্য পড়েচ?

সামান্যই পড়েচি।

এখন কি পড়চ?

সাঙ্খ্য-দর্শন।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আচ্ছা যাও, পড় গে।

কাশীনাথ চলিয়া গেল। তাহাকে কেন ডাকাইয়া আনা হইল, কেন যাইতে বলা হইল, তাহা সে কিছুই বুঝিল না। টোলে আসিয়া পুনরায় পুঁথি খুলিয়া বসিল। সে চলিয়া গেলে প্রিয়বাবু বলিলেন, কি পাগলের, না কিসের কথা বলছিলেন?

মধুসূদন কহিলেন, না, পাগল ঠিক নয়, কিন্তু ঐ একরকম, তাই কেউ কেউ ওকে পাগল বলে।

কি রকম?

সর্বদা পুঁথি নিয়ে বসে থাকে, না হয় আপন মনে ঘুরে বেড়ায়—কোনও কথায় বা কোনও কাজে থাকে না—এই রকম।

আর কিছু করে?

হয়ত কখনও বা একটা অন্ধকার ঘরের কোণে একা চুপ করে বসে থাকে।

প্রিয়বাবু হাসিয়া বলিলেন, আর কিছু?

এ হাসির অর্থ মধুসূদন ভট্টাচার্য যেন কতক বুঝিতে পারিলেন। অল্প অপ্রতিভভাবে বলিলেন, না, আর কিছু নয়।

তবে বাটির ভেতর একবার জিজ্ঞাসা করে আসুন। তাঁদের যদি মত হয় ত এই মাসের মধ্যে বিবাহ দিয়ে ফেলি।

ভিতরে আসিয়া মধুসূদন গৃহিণীকে এ কথা জানাইলে তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বিস্ময়ের মাত্রা কিঞ্চিৎ শমিত হইলে বলিলেন, কাশীর সঙ্গে প্রিয়বাবুর মেয়ের বিয়ে? তুমি কি পাগল হলে নাকি?

এতে পাগলের কথা আর কি আছে?

নাই কি?

কাশীনাথ কত বড় কুলীনের ছেলে মনে আছে কি?

গৃহিণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আমার হরির সঙ্গে হয় না?

দুইজনেই জানিতেন, তাহা হয় না। কর্তাও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মত কি?

গৃহিণী বিষণ্ণভাবে বলিলেন, মত আর কি—হয় হোক।

কর্তা বাহিরে আসিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণীর এতে আনন্দের সীমা নাই। উনিই কাশীর জননীস্থানীয়া—যখন কাশীনাথ দু'বছরের, তখন আমার ভগিনীর মৃত্যু হয়। সেই অবধি একরকম উনিই মানুষ করেচেন। তার পর যখন স্বর্গীয় বাঁড়ুয্যেমশায়ের পরলোক হয়, তদবধি ত এইখানেই আছে।

প্রিয়বাবু কহিলেন, সমস্তই আমি জানি। তবে আজই সমস্ত স্থির করে ফেলুন।

কি স্থির করতে হবে? আপনার যেদিন সুবিধা হবে, সেইদিনই আমি আশীর্বাদ করে আসব।

সে কথা নয়; কৌলীন্যের মর্যাদাটা?

সে-বিষয়ে আমি আর কি স্থির করব? মশায় যা অনুমতি করবেন তাই হবে। তবে আপনার ভাবী জামাতার মাতুলানী—তিনিই মাতৃস্থানীয়া—তাঁর মত একবার শোনা আবশ্যক।

অবশ্য, অবশ্য! তাই ত বলছিলাম।

পরে মাতুলানীর মত লইয়া, প্রিয়বাবুর স্ব-ইচ্ছায় স্থির হইয়া গেল যে, জননীস্থানীয়া ভট্টাচার্যগৃহিণী এক সহস্র নগদ না লইয়া কাশীনাথের কিছুতেই বিবাহ দিবেন না। তাহাই হইল; প্রিয়নাথবাবু ইহাতে আপত্তি করিলেন না।

.

তিন

পূর্বে যাহাই হউক, যখন দেখিল, সে রীতিমত স্থায়ীরূপ ঘরজামাই হইয়া পড়িয়াছে, তখন কাশীনাথের মনে আর সুখ রহিল না। এখন সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে আর যাইতে পারে না; যথা ইচ্ছা তথায় দাঁড়াইতে পায় না; যাহার তাহার সহিত কথা কহিতে পায় না; সব জিনিস হইতে তাহাকে যেন পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। সে যেখানে যাইতে চাহে, সেইখানেই হয়ত তাহার শ্বশুরের অমত হয়, না হয় শাশুড়ী ঠাকুরানী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠেন, কি, আমার জামাই অমুকের মাটিতে মাড়াইবে? জামাই অমনই সঙ্কুচিত হইয়া যায়। কেন এমন হইল, কেন তাহাকে এমন করিয়া রাখা হইতেছে, এমন করিয়া কাহার কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, কাশীনাথ তাহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারে না। সময়ে সময়ে মনকে প্রবোধ দেয়, আমি কি আর যে-সে লোক আছি যে, যা-তা করিব।

কিন্তু ভিতরটা কাঁদিয়া বলে, স্বস্তি পাই না–স্বস্তি পাই না। সে কণ্টকময় বনে স্বেচ্ছায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, এখন স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারে। অসীম উদ্দাম সাগরে ভাসিয়া যাইতেছিল, এখন তাহাকে একটা চতুর্দিকে বাঁধা পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সাগরে যে সে বড় সুখে ভাসিয়া যাইতেছিল তাহা নহে–সেখানে ঝড়-বৃষ্টি ও তরঙ্গে উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু এ নির্মল সরোবর তাহার আরও কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। এক-একসময়ে মনে হইত, যেন এক কটাহ উষ্ণ জলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলে মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করিয়া তাহার দেহটাকে কিনিয়া লইয়াছে; সেটা যেন আর তাহার নিজের নাই। মাথায় সে টিকি নাই, কণ্ঠে সে তুলসীর মালা নাই, সে খালি পা নাই, সে খালি গা নাই, সে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের টোল নাই, নদীর ধারের অশ্বত্থবৃক্ষ নাই, চণ্ডীমণ্ডপের কোণ নাই–কিছুই নাই।

সে নবজন্ম লাভ করিয়া পূর্বজন্মের সমস্ত বস্তু ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কিংবা তাহার দেহ আর মন যেন বিবাদ করিয়া পৃথক হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় মনটা যখন নদীর ধারের অশ্বত্থ-বৃক্ষমূলে, কি মাঠের ভিতর কৃষকদিগের মধ্যে বিচরণ করিতে থাকে, দেহখানা তখন হয়ত চমৎকার বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া গাড়ি চড়িয়া বেড়াইয়া আসে।

মনটা যখন কোমরে গামছা বাঁধিয়া নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, দেহটা হয়ত তখন জলচৌকির উপর বসিয়া ভৃত্যহস্তে সাবান-জলে পরিষ্কৃত হইতে থাকে। এইরূপে একটা কাশীনাথ সর্বদা দুইটা কাজ করিয়া বেড়ায়, অথচ কোনটাই তাহার সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না, সম্পূর্ণও হয় না।

কতদিন এইরূপে কাটিল। এক মাস দুই মাস করিয়া শ্বশুরালয়ে তাহার এক বৎসর কাটিয়া গেল। প্রথম কয়েক মাস তাহার মন্দ অতিবাহিত হয় নাই। আমোদ-উৎসাহে বিশেষ একটা নূতনত্বের মোহে সে নিজের অবস্থার দোষগুণ বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবার সময় পায় নাই; যখন পাইল, তখন দিন দিন শুকাইতে লাগিল। অপর কেহ এ

কথা না বুঝিতে পারিলেও কমলা বুঝিল; তাহার চক্ষু স্বামীর অবস্থা ধরিয়া ফেলিল। একদিন সে বলিল, তুমি শুকিয়ে যাচ্চ কেন?

কে বললে?

আমার চোখ বললে।

ভুল বলচে।

কমলা ধরিয়া বসিল, কি হয়েছে আমাকে বলবে না?

কিছুই ত হয়নি!

হয়েচে।

হয়নি।

নিশ্চয় হয়েছে। আমার মন সব জানতে পারে।

কাশীনাথ মুখ ফিরাইয়া বলিল, তুমি বড় বিরক্ত কর, আমি এখান থেকে যাই।

কাশীনাথ চলিয়া যায় দেখিয়া কমলা হাত ধরিল; কাতর হইয়া কহিল, যেও না–আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করব না। কাশীনাথ একবার বসিল, কিন্তু পরক্ষণেই উঠিয়া চলিয়া গেল। কমলা আর বসিতে বলিল না, কিন্তু চলিয়া গেলে বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কাশীনাথ বাহিরে আসিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার উপর কাহারও চক্ষু নাই। তখন ধীরে ধীরে ফটক পার হইয়া রাস্তা বাহিয়া চলিতে লাগিল। অনেকদূর গিয়া দেখিতে পাইল, একজন দরোয়ান তাহার পশ্চাতে আসিতেছে। কাশীনাথ বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া কহিল, তুই কোথায় যাচ্ছিস?

সে সেলাম করিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে।

আমার সঙ্গে যেতে হবে না–তুই ফিরে যা।

সন্ধ্যার সময় একা বেড়াবেন?

কোন উত্তর না দিয়া কাশীনাথ চলিতে লাগিল। দরোয়ান বেচারী কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া একটু দাঁড়াইয়া নিজের বুদ্ধি খরচ করিয়া স্থির করিল, যাওয়াই উচিত।

কাশীনাথ তাহা কিছুই লক্ষ্য করিল না। আপন মনে চলিতে চলিতে মামার বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া শূন্যমনে একটা ঘরের বারান্দায় আসিয়া উপবেশন করিল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর, হরিবাবু বেড়াইতে যাইতেছিলেন, তিনি তাহাকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হইয়াছে, বারান্দায় অল্প অন্ধকারও হইয়াছে, সুতরাং চিনিতে পারিলেন না। নিকটে আসিয়া বলিলেন, কে ও?

কাশীনাথ বলিল, আমি।

হরিবাবু অতিশয় বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিলেন, কে ও, জামাইবাবু নাকি?

কাশীনাথ মৌন হইয়া রহিল। তখন হরিবাবু চিৎকার করিয়া ডাকিলেন, ও মা, দেখে যাও, জমিদারদের জামাইবাবু এসেচেন–বসবার জায়গাও কেউ দেয়নি।

হরির মা বাহিরে আসিলেন, বলিলেন, তাই ত! দুঃখী মামীকে মনে পড়েচে বাবা?

কাশীনাথ বরাবর চুপ করিয়াই রহিল। তখন মাতুলানী আপনার কন্যা বিন্দুবাসিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, বিন্দু, একবার এদিকে আয় মা–তোর কাশীদাদা এসেচেন, একটা বসবার আসন দে, আমি ততক্ষণ আহ্নিকটা সেরে আসি।

বিন্দুবাসিনী মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা। গৃহস্থঘরের বৌ বলিয়া বাপের বাড়িতে বড় একটা আসিতে পারে না। আজ মাস-খানেক হইল এখানে আসিয়াছে।

আসিয়া অবধি তাহার কাশীদাদার সহিত দেখা হয় নাই। কাশীদাদাকে সে বড় ভালবাসিত, তাই নাম শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল। আসিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই, শুধু একজন বাবু অন্ধকারে বারান্দায় বসিয়া আছে। এরূপ কাশীদাদা পূর্বে সে দেখে নাই। বড়লোকের জামাতা হইয়াছে এবং বাবু হইয়াছে দেখিয়া তাহার হাসি আসিল, কিন্তু নিকটে আসিয়া অন্ধকারেও দাদার মুখখানা এত ম্লান বোধ হইল যে, সে আর হাসিতে পারিল না। কাশীনাথের মুখ ম্লান হইতে পূর্বে কেহ দেখে নাই, বিশেষ বিন্দু—বাড়ির মধ্যে সেই কেবল কাশীনাথকে কিঞ্চিৎ চিনিতে পারিয়াছিল। সে নিকটে আসিয়া সস্নেহে হাত ধরিয়া বলিল, কাশীদাদা! এখানে একলা কেন? চল, আমার ঘরে গিয়ে বসবে চল। কাশীনাথ বিন্দুর ঘরে আসিয়া শয্যার উপর উপবেশন করিল।

বিন্দু কহিল, কাশীদাদা, আমি কতদিন এসেচি, তুমি একদিনও দেখতে আসনি কেন?

আসতে পারিনি বোন।

কেন আসতে পারনি?

কাশীনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আসতে দেয় না।

আসতে দেয় না? সে কি?

কাশীনাথ অন্যমনস্কভাবে কহিল, ঐ রকম।

বিন্দু দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে দেয় না?

না, দেয় না। আমি কোথাও গেলে শ্বশুরমশায়ের অপমান বোধ হয়।

বিন্দু বুঝিল, এ-সকল কথা বলিতে কাশীনাথের ক্লেশ বোধ হইতেছে, তাই অন্য কথা পাড়িয়া বলিল, দাদা, তোমার বৌ দেখালে না?

কাশীনাথ মৌন হইয়া রহিল।

বিন্দু আবার বলিল, কেমন বৌ হয়েচে?

ভাল।

তবে আমি একদিন গিয়ে দেখে আসব।

কাশীনাথ মুখ তুলিয়া বিন্দুর মুখের পানে চাহিল; ঈষৎ হাসিয়া বলিল, যেও।

এমন সময় গুমগুম শব্দে একখানি গাড়ি আসিয়া সদরে থামিল। বিন্দু বলিল, ঐ বুঝি তোমার গাড়ি এল।

বোধ হয়। যাবার সময় জিজ্ঞাসা করিল, কবে যাবে?

কোথায়?

বৌ দেখতে।

বিন্দু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, তোমার যবে সুবিধা হবে, সেই দিন এসে নিয়ে যেও।

কাল আসব?

এসো।

পরদিন কাশীনাথ গাড়ি লইয়া নিজে আসিল। বিন্দুর যাইবার সময় কোথা হইতে হরিবাবু আসিয়া পড়িলেন। তিনি আসিবার সময় গাড়ি দেখিয়া কাশীনাথের আগমন কতকটা অনুমান করিয়াছিলেন। ভিতরে আসিয়া বিন্দু কোথায় যাইতেছে জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন, বৌমাকে একবার দেখতে যাচ্ছে।

কোন্ বৌমাকে? জমিদারের মেয়েকে?

গৃহিণী কথা কহিলেন না। তখন হরিবাবু মহাগম্ভীরভাবে কহিলেন, বিন্দু যদি ওখানে যায়, তা হলে এ জন্মে আমি আর ওর মুখ দেখব না।

মা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, সে কি রে! ভাইয়ের বৌকে দেখতে যাবে তাতে দোষ কি?

দোষের কথা তোমাকে বুঝিয়ে দেবার সময় নাই। বিন্দু যদি আমার কথা না শোনে, তাহলে এ বাড়িতে সে যেন আর না আসে।

হরিদাদা কি প্রকৃতির মানুষ, বিন্দুর তাহা অবিদিত ছিল না। সে নিঃশব্দে ঘরে গিয়া কাপড়-চোপড় খুলিয়া রাখিল। কাশীনাথ দাঁড়াইয়া সব দেখিল। তাহার পর ম্লান মুখে গাড়িতে আসিয়া বসিল।

সন্ধ্যার সময় কমলা জিজ্ঞাসা করিল, কৈ, ঠাকুরঝি এলেন না?

কাশীনাথ কাতরভাবে বলিল, তাঁরা পাঠালেন না।

কেন?

তা জানি না। বোধ হয়, এখানে পাঠাতে তাঁদের লজ্জা বোধ হয়। কথা গুলি কমলার বুকের ভিতর গিয়া বিঁধিয়া রহিল।

.

চার

জমিদার প্রিয়বাবুর একটিমাত্র সন্তান কমলা। প্রিয়বাবু আরও দুইটি সংসার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সন্তানাদি হয় নাই। সে সমস্ত গত হইলে, মনের দুঃখে বৃদ্ধাবস্থায় আর একটি সংসার পাতাইলেন—তাহার ফল একটি মাত্র কন্যারত্ন। নিঃসন্তানের সন্তান হইলে পুত্র-কন্যার ভেদ রাখে না। তাই কমলা কর্তার উপর কর্তা, গৃহিণীর উপরও গৃহিণী। তাহার কথা কাটে, কিংবা অমান্য করে, বাড়ির মধ্যে এ ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কমলা ধনবতী, বিদ্যাবতী, রূপবতী, গুণবতী—সর্ববিষয়ে সর্বময়ী কর্ত্রী; তথাপি একজনকে কিছুতেই সে আয়ত্ত করিতে পারিল না; যাহাকে পারিল না, সে তাহার স্বামী। কমলা অনেক করিয়া দেখিয়াছে। রাগ করিয়া দুঃখ করিয়া দেখিয়াছে, মান করিয়া অভিমান করিয়া দেখিয়াছে, আদর-যত্ন করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মন দখল করিতে পারে নাই। দখল করা দূরে থাকুক, তাহার বোধ হয় কাছে যাইতেও পারে নাই। একটা দরিদ্র লোক যে কত বড় মন লইয়া তাহার স্বামী হইয়া আসিয়াছে, তাহা সে কিছুতেই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে না। নিত্য দুইবেলা কমলা প্রার্থনা করিত, ঠাকুর, ওঁর মনটি আমাকে ধরিয়ে দাও। সময়ে সময়ে মনে করিত, বোধ হয় মনই নাই, তাই ধরিতে পারি না। কমলার নিকট তাহার স্বামী একটি জটিল রহস্য বলিয়া মনে হইত; যত দিন যাইতে লাগিল, উদ্ভেদের পন্থা পাওয়া দূরে থাক, তত অধিক জটিল বলিয়া মনে হইত। কখনও সে ভাবিত, স্বামীর এত অধিক ভালবাসা বোধ হয় কোনও স্ত্রী কখনও লাভ করে নাই; কখনও মনে হইত, এত দারুণ উপেক্ষাও বোধ হয় কখন কাহাকেও ভোগ করিতে হয় নাই। তথাপি কমলার দিন কাটিতে লাগিল; শুধু কাটে না কাশীনাথের; পুঁথিতেও আর মন বসে না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও বিরক্তি বোধ হয়, কথাবার্তা আমোদ-আহ্লাদেও প্রবৃত্তি হয় না। অমন হৃষ্টপুষ্ট শরীর কৃশ হইতে লাগিল, অমন গৌর বর্ণ কালো হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া আসিতেছে দেখিয়া কমলা কপালে করাঘাত করিল। পূর্বে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এ কথা আর জিজ্ঞাসা করিবে না, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা আর রক্ষা করা চলিল না। স্বামী আসিলে, তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

কাশীনাথ বিব্রত হইয়া কমলার হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই তুলিতে পারিল না।

কি হয়েচে, কাঁদচ কেন?

কমলা কথা কহিল না। বহুক্ষণ কাঁদিয়া-কাটিয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া কহিল, তুমি আমাকে একেবারে মেরে ফেল, এমন একটু একটু করে পুড়িও না।

কাশীনাথ অত্যন্ত বিস্মিত হইল—কেন, করেচি কি?

তা কি তুমি জান না?

কৈ, কিছুই না।

আর যা ইচ্ছে কর, কিন্তু আমার দাঁড়াবার একটু স্থান রেখো।

এবার কাশীনাথ কমলাকে তুলিতে পারিল, কাছে বসাইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে, বেশ করে বুঝিয়ে বল দেখি?

তুমি রোজ রোজ এমন হয়ে যাচ্ছ কেন?

আমার শরীর কি বড় মন্দ হয়েচে?

কমলা চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতেছিল; সেইভাবেই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হয়েচে।

আমিও বুঝতে পারি, হয়েচে—কিন্তু কি করব বল?

কমলা মুখ তুলিয়া বলিল, ওষুধ খাও।

কাশীনাথের হাসি আসিল, কহিল, ওষুধে সারবে না।

তবে কিসে সারবে?

তা জানিনে।

ওষুধে সারবে না, কিসে সারবে তাও জান না; তবে কি আমার কপালটা একেবারে পুড়িয়ে দেবে?

কাশীনাথ সাদাসিধা মানুষ, টোলে-পড়া বিদ্যা, সোহাগ-আদরও জানিত না; প্রণয়-সম্ভাষণও তাহার আসিত না; কিন্তু এখন স্বাভাবিক স্নেহে অনুপ্রাণিত হইয়া কমলার হাত ধরিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিয়া সে বলিল, এখানে সুখ পাই না—তাই বোধ হয় এমন হয়ে যাচ্ছি।

তবে এখানে থাক কেন?

না থাকলে কোথায় যাব?

এখান ছাড়া কি আর জায়গা নেই? যেখানে সুখ পাও, সেখানে গিয়ে থাক।

তা হয় না।

কেন হয় না?

এখানে না থাকলে কি শ্বশুরমশায়ের ভাল বোধ হবে?

আর এমন করে শুকিয়ে গেলেই কি তাঁর ভাল বোধ হবে?

ভাল বোধ হবে না, কিন্তু উপায় কি? তোমার বাবা গরীব দেখে—

কমলা মুখ চাপিয়া ধরিল—ছি, ও-সব কথা ব'ল না। আমাকে সব কথা খুলে বল, আমি উপায় করে দেব।

কাশীনাথ চিন্তা করিয়া কহিল, সব কথা তোমাকে খুলে বলা যায় না। আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, এই-সব দেখে শুনে মনে হয়, আমাদের এ বিয়ে না হলেই ভাল হ'ত।

কেন?

তুমিই বল দেখি, আমাকে পেয়ে কি একদিনের তরেও সুখী হয়েচ? আমি সোহাগ জানিনে, আদর জানিনে, ধরতে গেলে কিছুই জানিনে। তোমাদের এই বয়সে কত সাধ, কত কামনা, কিন্তু তার একটিও কি আমাকে দিয়ে পূর্ণ হয়? আমি যেন তোমার স্বামী নয়, শুধু তার ছায়া।

কমলার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সব কথা সে ভাল বুঝিতেও পারিল না। একটা কথা তাহার অন্তরের ভিতর হইতে এতক্ষণ ধরিয়া বাহির হইবার নিমিত্ত ছটফট করিতেছিল, সেটাকে যেন বলপূর্বক একটা বায়ুহীন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, বিষম পীড়াপীড়ি করিয়া এইবার বাহির হইয়া পড়িল। কম্পিতকণ্ঠে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কি তুমি দেখতে পার না?

সে কথা আর একদিন বলব।

না, বল—কিন্তু আমাকে বিয়ে করে কি তুমি সুখী হওনি?

কি জানি, হয়ত না।

অন্য কা'কে বিয়ে করলে কি সুখী হতে?

তাও ত ঠিক বলতে পারিনে।

শুনিয়া কমলার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিল। এই সময় একজন দাসী বাহির হইতে বলিল, দিদিমণি, মার বড় জ্বর হয়েছে—তোমাকে ডাকছেন।

কমলা চক্ষু মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

.

পাঁচ

গৃহিণীর সে জ্বর আর সারিল না। পনের দিবসমাত্র ভুগিয়া, সকলকে কাঁদাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পত্নীশোক প্রিয়বাবুর বড় বাজিল। এই বৃদ্ধবয়সে তিনিও বুঝিলেন, তাঁহাকেও অনেকদিন পৃথিবীতে থাকিতে হইবে না। এইবার কমলার অনেক কাজ পড়িল; নিজের সুখ-চিন্তা ব্যতীতও পৃথিবীতে অনেক কিছু করিতে হয়। বৃদ্ধ পিতা ক্রমশঃ অপটু হইয়া আসিতেছেন, কমলা সর্বদাই পিতার নিকট থাকিতে লাগিল। আর কাশীনাথ? সে সৃষ্টিছাড়া লোক; এইবার যেন সময় বুঝিয়া পুস্তকের রাশি লইয়া গৃহের কবাট রুদ্ধ করিয়া বসিল। যখন পুস্তকে মন লাগে না, তখন বাহির হইয়া যায়। কখন হয়ত একাদিক্রমে দুইদিন ধরিয়া বাটীতেই আসে না। কোথায় আহার করে, কোথায় নিদ্রা যায়, কেহই জানিতে পারে না। এ-সব দেখিয়া শুনিয়া কমলা একরকম হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। সে যুবতী হইলেও এখনও বালিকামাত্র। স্বামী-প্রীতি, স্বামী-ভক্তি এখনও তাহার শিক্ষা হয় নাই। শিখিতেছিল—বাধা পড়িয়াছে; আবার স্বামী-কর্তৃকই বাধা পড়িয়াছে। তাহার দোষ কি? সে যাহা শিখিয়াছিল, ক্রমশঃ ভুলিতে লাগিল। যে-সব সোনার দাগ বুকের মাঝে ঈষৎ পড়িয়াছিল, তাহা এখনও উজ্জ্বল হয় নাই, বাহিরের সৌন্দর্য এখনও ভিতরে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে নাই—অযত্নে অসাবধানে তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে যখন একেবারে মিলাইয়া গেল—কমলা তখন জানিতেও পারিল না। একখানা ভগ্ন অট্টালিকার দুই-একখানা ইঁট, দুই-একটুকরা কাঠ-পাথর বুকের মাঝে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত আছে—কখনও কখনও দেখিতে পাইত, কিন্তু সে-সকল একত্র করিয়া আবার জোড়া দিয়া অট্টালিকা গাঁথিবার তাহার ইচ্ছাও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। এখানে এক সময়ে একটা রাজপ্রাসাদ ছিল, প্রমোদকানন ছিল—স্বপ্নের ঘোরে আসিয়াছিল,

স্বপ্নশেষে চলিয়া গিয়াছে। সে স্বপ্ন ফিরিয়া দেখিবারও তাহার আর সাধ নাই। যাহা গিয়াছে—তাহা গিয়াছে।

বৃদ্ধ পিতার সেবা করিয়া, দাসদাসীকে আদর-যত্ন করিয়া, কর্মসুখে তাহার দিন অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু একের যাহাতে সুখ হয়, অন্যের তাহাতে ত হয় না! কমলা যে সুখ অনুভব করিতে লাগিল, বুড়া ঝি তাহাতে মর্মে ক্লেশ পাইতে লাগিল। অনেক দেখিয়া শুনিয়া সে গোপনে একদিবস প্রিয়বাবুকে কহিল, জামাইবাবু যেন কি-রকম হয়ে যাচ্ছেন, কখন বাড়িতে থাকেন, কখন চলে যান—কখন কি করেন, বাড়ির কেউ জানতে পারে না। দিদিমণির সঙ্গেও বোধ হয় কথাবার্তা নেই।

প্রিয়বাবু নিজের শরীর ও মন লইয়া বিব্রত ছিলেন, এ-সকল দেখিতে পাইতেন না। বৃদ্ধা দাসীর কথায় তাঁহার চৈতন্য হইল। কমলা আসিলে সস্নেহে কহিলেন, মা, আমি যা জিজ্ঞাসা করব, তার যথার্থ উত্তর দেবে?

কমলা পিতার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি কথা বাবা?

দেখ মা, আমাকে লজ্জা করবার আবশ্যক নাই; বাপের কাছে বিপদের সময় কোনও কথা গোপন করতেও নাই, আমাকে সব কথা খুলে বল—আমি নিজে সমস্ত মিটিয়ে দিয়ে যাব।

কমলা মৌন হইয়া রহিল। প্রিয়বাবু আবার কহিলেন, সুখে থাকবে বলে তোমাকে সুপাত্রের হাতে দিয়েচি। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই—কিন্তু তোমাকে অসুখী দেখে মরেও আমার সুখ নেই। বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কমলার চক্ষু দিয়াও জল পড়িতেছিল; বৃদ্ধ সে অশ্রু সস্নেহে মুছাইয়া বলিলেন, সব কথা আমাকে খুলে বলবি নে মা? কিন্তু কি বলিতে হইবে কমলা তাহা খুঁজিয়া পাইল না। প্রিয়বাবু কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া আবার কহিলেন, ঝগড়া হয়েছে বুঝি? কমলা ভাবিল, ভাব থাকলে ত ঝগড়া হবে! ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

ঝগড়া হয়নি? তবে সে বুঝি তোকে দেখতে পারে না?

কমলার একবার ইচ্ছা হইল—বলে, তাই বটে! কিন্তু তাহা পারিল না। স্বামী তাহাকে দেখিতে পারে না বলিতে তাহার বুকে বাজিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

প্রিয়বাবু ম্লানমুখে হাসিয়া বলিলেন, তবে তুই বুঝি দেখতে পারিস নে?

কমলা ভাবিল, তাই হবে বুঝি। আমিই হয়ত দেখতে পারিনে। কিন্তু সে কি কথা! আমি আমার স্বামীকে দেখতে পারিনে? কমলা শিহরিয়া বুকের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিবার প্রয়াস করিল—দেখিল, সেখানকার গীত-বাদ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে; শুধু মাঝে মাঝে দুই-একজন জিনিসপত্র সরাইয়া লইতে আসিতেছে, যাইতেছে; তাঁহাদেরই করস্থিত বাদ্যযন্ত্রে অসাবধানে কখনও হয়ত একটু-আধটু সুর বাহির হইয়া পড়িতেছে; কখনও হয়ত দুই-একজন অভিনেতা পাশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। কমলা কাঁদিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু আবৃত করিল।

প্রিয়বাবু অতিশয় কাতর হইলেন; বলিলেন, কেন কাঁদিস্ মা?

বাবা আমরা যেন কেউ কারো নয়।

প্রিয়বাবু ধীরে ধীরে কন্যাকে আপনার বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, ছি মা, ও-কথা কি মুখে আনে? তুই যার মেয়ে সে যে আমার সর্বস্ব ছিল; এখনও রোজ রাত্রে সে আমার পায়ের কাছে এসে বসে থাকে—শুধু তোদের ভয়ে দিনের বেলা আসে না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, যদি সে এসে তোর এ কথা শুনতে পায় তা হলে মনে বড় দুঃখ পাবে।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, ঘরটায় অন্ধকারও হইয়াছিল; কমলা সচকিতে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল, বাস্তবিক কেহ ঘরে আসিয়াছে কি না। কেহ কোথাও নাই দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। সে তখন বাহিরে আসিল, তখন তাহার পা কাঁপিতেছিল; শরীর এত দুর্বল

বোধ হইতেছিল, যেন অর্ধেক রক্ত কেহ বাহির করিয়া লইয়াছে। তাহার কাজকর্ম সমাপ্ত করিয়া, যে ঘরে কাশীনাথ মাটির উপর আসন পাতিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া পুঁথি খুলিয়া বসিয়া ছিল, সেইখানে গিয়া উপবেশন করিল।

কাশীনাথ মুখ তুলিয়া দেখিল, কমলা। বিস্ময়ে বলিল, তুমি যে?

আমি এসেচি।

বস, বলিয়া কাশীনাথ আবার পুঁথিতে মন সংযোগ করিল। কমলা বহুক্ষণ ধরিয়া তাহার পুঁথি-পাঠ দেখিল, তাহার পর হাত দিয়া পুঁথি বন্ধ করিয়া দিল। কাশীনাথ আশ্চর্য হইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, বন্ধ করলে যে?

দুটো কথা কও। রোজ পড়—একটু না পড়লে ক্ষতি হবে না।

এই জন্যে বন্ধ করে দিলে?

শুধু তাই নয়; বিরক্ত হবে, বকবে—এজন্যও বটে।

কাশীনাথ অল্প হাসিয়া বলিল, কেন বিরক্ত হব কমলা? তোমাকে কখনও কি আমি বকেচি? কথা কও না, কাছে এস না, বই না পড়লে কেমন করে দিন কাটবে বল দেখি? একটু হাসিয়া বলিল, জ্বর হয়েচে, আজ দু' দিন কিছুই খাইনি, তা তুমি ত একবার খোঁজ নাওনি।

কমলা মুখ তুলিয়া দেখিল, স্বামীর মুখ বড় শুষ্ক; কপালে হাত দিয়া দেখিল, গা গরম। তখন কাঁদিয়া স্বামীর কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল। লজ্জায় তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি আমার দোষ ভুলে গিয়ে আর একবার আমাকে নাও, তোমার সব ভার আমাকে নিতে দাও।

আমি পারি, কিন্তু তুমি রাখতে পারবে কি?

কেন পারব না?

দেখি।

আমাকে নাও।

অনেকদিন নিয়েচি, কিন্তু তুমি বুঝতে পার না, এখনও হয়ত সব সময় ঠিক বুঝতে পারবে না।

কমলা প্রদীপের আলোকে সে মুখ যতখানি পারিল দেখিয়া লইল। একবার যেন মনে হইল, সে মুখে ছাই-ঢাকা অনেক আগুন আছে, মোম-ঢাকা অনেক মধু আছে। মুহূর্তের জন্য তাহার আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। সে পূর্ণাবেগে কহিয়া উঠিল, কেন তুমি এতদিন তোমাকে চিনতে দাওনি? কেন এতদিন আমাকে লুকিয়ে রেখে আমাকে এত কষ্ট দিলে? আনন্দের উচ্ছ্বাসে কমলা স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিল। কাশীনাথের চক্ষু দিয়াও সেদিন জল পড়িতে লাগিল।

.

ছয়

পরদিন প্রিয়বাবু কাশীনাথকে ডাকিয়া পাঠাইয়া কহিলেন, বাপু, আমি আর অধিক দিন বাঁচব না। আমার নেই পুত্র, বিষয়-আশয় যা কিছু রেখে যেতে পারলাম, তা সমস্তই তোমাদের রইল। যে ক'টা দিন বাঁচি, তার মধ্যে সমস্ত বুঝে-সুঝে নাও—না হলে কিছুই থাকবে না, অপরে সমস্ত ফাঁকি দিয়ে নেবে।

কাশীনাথ অবনত মস্তকে কহিল, আজ্ঞা করুন।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আজ্ঞা আর কি করব! কাল হতে সকালবেলাটা একবার করে কাছারি-ঘরে গিয়ে ব' স।

যে আজ্ঞে, বলিয়া কাশীনাথ প্রস্থান করিল। প্রিয়বাবু কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, মা, বুড়া হয়েচি, বিষয় দেখিতে পারি না, তাই কাশীনাথকে আমার জমিদারির সমস্ত ভার দিলাম। উত্তরকালে তার কাজ করতে অসুবিধা না হয়, এজন্য মধ্যে মধ্যে উপদেশ দেব। কয়েক দিবস তিনি নিজে কাছারি-ঘরে গিয়া কাশীনাথকে জমিদারি-সংক্রান্ত অনেক বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। সেও হাতে একটা কাজ পাইয়া খুশি হইল। জমিদার-বাড়ির ভিতরে ভিতরে যে একটা দাহ উপস্থিত হইয়াছিল, অনেকদিন পরে তাহার জ্বালা যেন ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে লাগিল।

কাশীনাথ নিয়মিতভাবে কাছারির কাজকর্ম করে, কমলা নিয়মিতভাবে সংসার চালাইয়া যায় এবং প্রিয়বাবু নিয়মিতভাবে শয্যায় শুইয়া থাকেন। সংসার বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কিছু দিবস পরে প্রিয়বাবুর শরীরের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল। একদিবস তিনি কমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি উইল করেচি। পরে উপাধানের নিম্ন হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।—আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক আমার জামাতা কাশীনাথকে ও অপর অর্ধেক কন্যা কমলা দেবীকে দান করিলাম। কেমন ভাল হয়নি মা? কমলা কথা কহিল না। প্রিয়বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন মা, তোমার মনোমত হয়নি কি? এ উইল তিনি বিশেষ করিয়া কমলাকে খুশি করিবার জন্যই করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, তাহার স্বামী সম্পত্তির সত্যকার মালিক হইলে কমলাও অত্যন্ত প্রীত হইবে। কিন্তু কমলা যে কথা ভাবিতেছিল, তাহা মুখে বলিতে লজ্জা করিতে লাগিল। প্রিয়বাবু পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু বলবে কি?

কমলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

কি মা?

কমলা একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, সমস্ত বিষয় আমার নামে লিখে দাও।

সে কি কথা মা?

কমলা মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রিয়বাবু প্রাচীন লোক। সংসারে অনেক দেখিয়াছেন, অনেক শুনিয়াছেন; কমলার মনের কথা তাঁহার নিকট প্রচ্ছন্ন রহিল না।

একে একে সব কথা যেমন তলাইয়া বুঝিতে লাগিলেন, অল্প অল্প করিয়া তেমনই অবসন্নতা তাঁহার শরীর ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। উপাধানে ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়াছিলেন, এখন সেই উপাধানে মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, তুমি আমার একমাত্র সন্তান, তোমার মনে দুঃখ দিতে চাই না। সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে যাব। কিন্তু কাজটা ভাল হবে না। আশীর্বাদ করি, সুখী হও। কিন্তু সে ভরসা আর করতে পারি না। দীর্ঘজীবনে অনেক দেখেছি, নিজেও তিনবার বিবাহ করেছি—এরূপ মন নিয়ে জগতে কোনও স্ত্রী কখনও সুখী হতে পারে না। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া আবার বলিলেন, দেখতে ভাল হবে, তুমি খুশি হবে, এই মনে করে, তোমাদের দু'জনকেই সমান ভাগ করে সমস্ত বিষয় দিয়ে যাচ্ছিলাম; জানতাম, তুমি আর সে ভিন্ন নও। আচ্ছা, বল দেখি মা, কিজন্য তার বিষয়প্রাপ্তিতে তোমার অমত হচ্ছে?

কমলা কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল, বিষয় পেলে আর আমার পানে ফিরে চাইবেন না।

বিষয় না পেলে?

আমার হাতে থাকবেন।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আমি কাশীনাথকে চিনি, কিন্তু তুমি চেন না। সে ঠিক তার বাপের মত। যদি তোমায় দেখতে না পারে, তা হলে বিষয় পেলেও দেখতে পারবে না, না পেলেও দেখতে পারবে না। আর কমলা! এমন করেই কি স্বামীকে হাতে রাখা যায়?

জোর করে বনের বাঘ বশ করতে পারা যায়, কিন্তু জোর করে একটি ছোট ফুলকেও ফুটিয়ে রাখা যায় না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পুনরায় কহিলেন, প্রার্থনা করি সফল হও—কিন্তু এ ভাল উপায় নয়। সে যদি তোমাকে না নেয়, তা হলে কতটুকু তোমার অবশিষ্ট থাকবে? যেটুকু থাকবে, তাতে অর্ধেক সম্পত্তিতে কি চলে না? আরও এক কথা, স্বামীকে দেহ মন আত্মা পার্থিব অপার্থিব সব দিতে হয়—যাকে সব দিতে হয়, তাকে এই অর্ধেক বিষয়টুকু কি দেওয়া যায় না? কমলা, এমন করিস নে মা। যদি কখনও সে জানতে পারে, মনে কষ্ট পাবে।

কমলা কোনও উত্তর দিল না, প্রিয়বাবুও আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। দু'জনে প্রায় আধ-ঘণ্টা মৌন হইয়া রহিলেন। অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, দাসী প্রদীপ দিয়া গেল। কমলাও চক্ষু মুছিয়া আপনার নিত্যকর্মে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রিয়বাবু তাঁহার উকিলকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি উইল বদলাব।

উকিল জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপ বদলাবেন?

আমার জামাতার নাম কেটে সমস্ত সম্পত্তি কন্যাকে লিখে দেব।

কেন?

সে কথার প্রয়োজন নাই। যা বললাম, সেইরূপ লিখে দিন।

.

সাত

প্রিয়বাবুর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধশান্তি হইল, উইল দেখিয়া কাশীনাথ কিছুমাত্র দুঃখিত বা বিস্মিত হইল না। জগতে যাহা নিত্য ঘটে, যাহা ঘটা উচিত—তাহাই ঘটিয়াছে; ইহাতে

দুঃখই বা কি, আর আশ্চর্য বা কেন! তথাপি দেওয়ান মহাশয় কাশীনাথকে নিভৃতে পাইয়া বলিলেন, জামাইবাবু, কর্তা মহাশয় যে এরূপ উইল করিবেন, তাহা আমি কখনও ভাবি নাই। পূর্বে তিনি একবার উইল করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনাকে ও তাঁহার কন্যাকে সমান ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। সে উইল যে কাহার কথা শুনিয়া বা কি ইচ্ছায় বদলাইয়া দিলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

কাশীনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, বুঝবার প্রয়োজনই বা কি! যার বিষয় সে পেয়েচে; তাতে আমারই বা কি, আর আপনারই বা কি?

দেওয়ানজী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, তবুও—তবুও—

কিছুই 'তবুও' নাই। বস্তুতঃ আমার সম্পত্তিতে অধিকার কি? বরং আমাকে অর্ধেক দিয়ে গেলেই আশ্চর্য হবার কথা ছিল বটে। আরও, আমাকে অর্ধেক দেওয়াও যা, তাকে সমস্ত দেওয়াও তাই। কিছু প্রভেদ আছে কি?

দেওয়ান এবার বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইলেন। শুষ্কমুখে বলিলেন, না না, প্রভেদ কিছু নাই, আমি শুধু কর্তামশায়ের কথা বলছিলাম। তাঁর অভিপ্রায় আমি অনেক জানতাম, এই জন্যই এ কথা বলছিলাম।

তিনি তাঁর কর্তব্যই করেছেন। ভেবে দেখুন, স্ত্রীর স্বামী ভিন্ন গতি নাই, কিন্তু স্বামীর স্ত্রী ভিন্ন অন্য গতি আছে। আমি দরিদ্র; একেবারে অতটা বিষয় নিজ হাতে পেলে হয়ত কুফল ফলতে পারে, এই আশঙ্কায় বোধ হয় পূর্বের উইল বদলিয়ে গিয়েছেন।

বৃদ্ধ দেওয়ান মহাশয় কাশীনাথকে বরাবর পণ্ডিত-মূর্খ টুলো ভট্টাচার্য মনে করিতেন; তাহার মুখে এরূপ বুদ্ধির কথা শুনিয়া ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। এইরূপে বৃদ্ধ দেওয়ান উত্তরোত্তর কাশীনাথের বিজ্ঞতার যত পরিচয় পাইতে লাগিলেন, অন্যদিকে কমলার উত্তরোত্তর তত অজ্ঞতার পরিচয় পাইতে লাগিলেন। দিনের মধ্যে শতবার সে

আপনাকে প্রশ্ন করে, ইনি কেমনতর মানুষ? শতবার বিফল প্রশ্ন শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসিয়া কহে, বুঝিতে পারি না।

সহস্র পরিশ্রমে সহস্র চেষ্টায় কমলা কিছুতেই স্থির করিতে পারে না, এই দুই-হাত-পা-সমন্বিত মানুষটা কিসে নির্মিত।

মনটা তাহার নিজের শরীরের ভিতর রাখিয়াছে, না আর কাহারও কাছে জমা দিয়া আসিয়াছে? সে দেখে, সকলে যাহা করে, তাহার স্বামীও তাহাই করে। আহার করে, নিদ্রা যায়, জমিদারির কাজকর্ম, সংসারের কাজকর্ম সমস্তই করে, সমস্ত বিষয়ে যত্নশীল, অথচ সমস্ত বিষয়েই উদাসীন। কি যে তাহার স্বামী ভালবাসে, কিসে যে তাহার অধিক স্পৃহা, এতদিনেও কমলা তাহা ধরিতে পারিল না। কমলার অসুখের সময়ে কাশীনাথ অনিমেষচোখে দিবারাত্রি তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিত; সে মুখে কাতরতা, সে বুকে কত স্নেহ, কত ভালবাসা, যেন তাহা ফুটিয়া বাহির হইত; আবার ভাল হইবার পর কমলা পথের মাঝে পড়িলেও কাশীনাথ ফিরিয়া চাহে না, মুখ তুলিয়া দেখে না। আপনার মনে আপনার কর্মে চলিয়া যায়। কমলা অভিমান করিয়া দুইদিন কথা না কহিয়া দেখিয়াছে, কোন ফল নাই, কাশীনাথ কাছে আসিয়া আবার চলিয়া যাইত; না সাধিত, না কাঁদিত, না কথা কহিত। আবার কথা কহিলে হাসিয়া কথা কহিত; না কোনদিন বিরক্তি প্রকাশ করিত, না কোনদিন জিজ্ঞাসা করিত, কেন দুইদিন কথা কহ নাই, কেন রাগ করিয়াছিলে? কমলা দিন-কতক পরে নিজের মনে পরামর্শ আঁটিয়া এরূপ ভাব ধরিল, যেন সে তাহার উদাসীন স্বামীটিকে জানাইতে চাহে, তুমি আমাকে উপেক্ষা করিলে আমিও উপেক্ষা করিতে জানি। আর এত তোমাকে ভালবাসি না যে, তুমি মাড়াইয়া যাইবে, আর আমি ধূলার মত তোমার চরণতলে জড়াইয়া থাকিব! কমলা দেখা হইলে অন্যমনে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া যায়; যেন প্রকাশ করিতে চাহে, তোমাকে দয়া করিয়া স্বামী করিয়াছি বলিয়া এমন মনে করিও না যে, তোমার পায়ে প্রাণ পড়িয়া আছে এবং সেইজন্য যখনই দেখা হইবে, তখনই মিষ্ট হাসিয়া প্রীতি-সম্ভাষণ করিব। আমার কাজের সময় সামনে পড়িলে আমিও দেখিতে পাই না। যখন সে কোন দাসদাসীকে তিরস্কার করিতে থাকে তখন কাশীনাথ

দৈবাৎ যদি কোনও কথা বলিয়া ফেলে, তাহা হইলে সে কথা আদৌ কানে না তুলিয়া যাহা বলিতেছিল, তাহাই বলিতে থাকে; যেন বলিতে চাহে, আমার দাস, আমার দাসী, আমার বাড়ী, আমার ঘর; যাহাকে যাহা খুশি বলিব, তুমি তাহাতে অযাচিত মধ্যস্থ হইতেছ কেন?

কিন্তু ইহাতে কি তৃপ্তি হয়? এমন করিয়া কি বাসনা পুরে? তৃপ্তি হইতে পারিত যদি কাশীনাথকে একবিন্দু টলাইতে পারিত।

যাহাই কর, সে তাহার প্রশান্ত গম্ভীর মুখখানি লইয়া পরিষ্কার বুঝাইয়া দেয় যে, সে আপনাতে আপনি নিশ্চল বসিয়া আছে, সুমেরু শিখরের মত তাহাকে একবিন্দু স্থানচ্যুত করিবার ক্ষমতাও তোমার নাই। যত খুশি ঝড়-বৃষ্টি তোল, যত ইচ্ছা গাছপালা ওলট-পালট করিয়া দাও, কিন্তু আমাকে টলাইতে পারিবে না।

আচ্ছা, কমলা কি ভালবাসে না? বাসে, কিন্তু সে ভালবাসা অনন্ত অতলস্পর্শী নহে; কমলা যেন রেখা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে চাহে, তুমি ইহার বাহিরে যাইও না। যাইলে আমি সহ্য করিতে পারিব না। হয়ত তথাপিও ভালবাসিব কিন্তু তোমার মর্যাদা রক্ষা করিব না।

একদিন সে বৃদ্ধা দাসীর কাছে মনের দুঃখে কাঁদিয়া বলিল, বাবা আমাকে একটা জানোয়ারের হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন।

কেন দিদি?

কেন আবার জিজ্ঞাসা করিস? তোরা সবাই মিলে আমাকে কেন হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিসনি?

ও-কথা কি বলতে আছে দিদি?

কেন বলতে নেই? তোরা যে কাজটা করতে পারলি, আমি তার কথা মুখেও একবার বলতে পারব না।

না না, তা নয়। উনি দিব্যি মানুষ; তবে একটু পাগলামির ছিট্ আছে। ওঁর বাপেরও একটু ছিল, তাই জামাইবাবুরও–

তুই চুপ কর। পাগলের কথা মুখে আনিস নে। বাপ পাগল হলেই কিছু আর ছেলে পাগল হয় না। পাগল একটুকুও নয়, শুধু ইচ্ছে করে আমাকে কষ্ট দেয়।

স্বামী পাগল, একথা স্বীকার করিতে কমলার বুকে বাজিল।

আজ তিনদিন হইল কাশীনাথের দেখা নাই। দুইদিন কমলা ইচ্ছাপূর্বক কোন খোঁজ লইল না, কিন্তু তৃতীয় দিবসে উদ্বিগ্ন হইয়া বাহিরে দেওয়ানকে বলিয়া পাঠাইল, বাবু দুইদিন ধরিয়া বাটীতে আসে নাই, তোমরাও কোনও সন্ধান কর নাই, তবে কিজন্য এখানে আছ?

দেওয়ান ভাবিল, মন্দ নয়! কে কোথায় চলিয়া যাইবে, তাহার আমি কিরূপে সন্ধান রাখিব? পরে খাজাঞ্চির নিকট খবর পাইল যে জামাইবাবু তিন সহস্র টাকা লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, কিংবা কবে ফিরিবেন তাহা কাহাকেও বলিয়া যান নাই।

কমলা কিছুক্ষণ কপালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল; পরে তাহার পিতার উকিলবাবুকে ডাকিয়া বলিল, আমার বিষয়-সম্পত্তি দেখতে পারে, এমন একজন লোক এক সপ্তাহের মধ্যে বহাল করে দিন; যেমনই বেতন হোক, আমি দেব।

.

আট

কলিকাতার একটা ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত গলির ভিতর একখানা ছোট একতলা বাটীতে, সমস্ত দিন জলে ভিজিয়া, এক হাঁটু কাদা-পাঁক লইয়া কাশীনাথ প্রবেশ করিল। তাহার হাতে দুই শিশি ঔষধ, এক টিন বিস্কুট ও চাদরে বাঁধা বেদানা প্রভৃতি কতগুলি দ্রব্য ছিল।

এই বাটীর একটি কক্ষে নীচের শয্যায় একজন রোগী শয়ান ছিল এবং নিকটে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক তাহার মস্তকে হাত বুলাইতেছিল। কাশীনাথ প্রবেশ করিলে স্ত্রীলোকটি কহিল, কাশীদাদা, এত জলে ভিজে এলে কেন? কোথাও দাঁড়ালে না কেন?

তা কি হয় বোন? জলে ভিজে ক্ষতি হয়নি, কিন্তু দাঁড়ালে হয়ত হ' ত।

তা বটে। বিন্দু বুঝিয়া দেখিল, কাশীদাদার কথা অসত্য নহে—তাই চুপ করিয়া রহিল।

এই কয় বৎসর ধরিয়া বিন্দু যে ক্লেশ ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহা কেবল সেই জানে। আমরা তাহার বাপের বাড়িতে তাহাকে শেষ দেখিয়াছিলাম, আর দেখি নাই। এখন একটু তাহার কথা বলি। যেদিন সে জমিদারের মেয়েকে দেখিতে যাইবার সমস্ত উদ্যোগ করিয়াও যাইতে পায় নাই, তাহার পরদিনই গোপালবাবুর (তাহার শ্বশুরের) সহসা কঠিন ব্যাধির সংবাদ পাইয়া তাহাকে স্বামী-ভবনে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। সে আসিয়া দেখিল, তাহার শ্বশুরের যথার্থই বড় কঠিন পীড়া হইয়াছে। সকলে মিলিয়া যথাসাধ্য চিকিৎসা করাইল, কিন্তু গোপালবাবুর কিছুতেই প্রাণরক্ষা হইল না। পীড়া বড় বাড়িয়া উঠিলে গোপালবাবু কহিলেন, ছোটবৌমাকে একবার নিয়ে এস—তাঁকে একবার দেখব। ছোটবৌমা আমাদিগের বিন্দুবাসিনী। মৃত্যুর দুই-এক দিবস পূর্বে গোপালবাবু বিন্দুকে বলিলেন, মা, এই চাবি নাও, ঐ বাক্সে যা রইল সব তোমাকে দিলাম। বিন্দু হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল। অন্যান্য বধূরা মনে করিল, বৃদ্ধ মরিবার সময় বিন্দুকেই সব দিয়ে গেল। আরও এক কথা, গোপালবাবু পীড়ার মধ্যেই একদিন চারি সন্তানকেই কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ বাপু, তোমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে কিছুমাত্র মিল নাই এবং তোমাদের জননীও জীবিত নাই, তখন আমার মৃত্যু হলে তোমরা আর এক সংসারে থেকো না। মিথ্যা কলহ করে ভিন্ন হবার পূর্বে যেটুকু সদ্ভাব আছে, তা নিয়ে পৃথক হও। যা কিছু রেখে গেলাম, তার উপর কিছু কিছু উপার্জন করলে তোমাদের সংসার স্বচ্ছন্দে চলবে।

পিতার মৃত্যুর পরে সকলে পৃথক হইলে, বিন্দু একদিন বাক্স খুলিয়া দেখিল, ভিতরে একখানি রামায়ণ ও একখানি মহাভারত ভিন্ন আর কিছুই নাই। আশায় নিরাশ হইলেও

বিন্দু স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয়ের দান মাথায় তুলিয়া লইল। বিন্দু অস্ফুটস্বরে বলিল, তাঁহার স্নেহের দান—ইহাই আমার রত্ন।

দিন-কতক বিন্দুর সুখে-স্বচ্ছন্দে চলিল, তাহার পর বিপদের আরম্ভ হইল। বিন্দুর স্বামী যোগেশবাবু পীড়িত হইয়া পড়িলেন। বিন্দু শরীরপাত করিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিল, কয়েকখানি জমি বন্ধক দিয়া চিকিৎসা করাইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গ্রামস্থ কয়েকজন প্রতিবাসী তখন কলিকাতায় যাইয়া চিকিৎসা করাইতে বলিল। বিন্দুবাসিনী আপনার সমস্ত গহনা বিক্রয় করিয়া স্বামীকে লইয়া কলিকাতায় আসিল। এখানেও বহু রকমে চিকিৎসা করাইতে অবশিষ্ট জমিগুলি ক্রমশঃ বন্ধক পড়িল। কিন্তু রোগের কিছু হইল না। অর্থাভাবে এখন উত্তমরূপে চিকিৎসা করাইবার উপায় রহিল না। বিন্দু স্বামীর অগ্রজকে সব কথা লিখিয়া জানাইল। কিন্তু কোন ফল হইল না; তিনি উত্তর পর্যন্ত লিখিলেন না। তখন সে তাহার অপর দুই ভাশুরকে লিখিল, কিন্তু তাহারাও অগ্রজের পন্থা অবলম্বন করিয়া মৌন হইয়া রহিল। বিন্দু বুঝিল, এখন হয় উপবাস করিতে হইবে, না হয় বিষ খাইয়া মরিতে হইবে।

স্ত্রীর মুখ দেখিয়া যোগেশবাবু সমস্তই বুঝিতে পারিতেন। একদিন তাহাকে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে হাত ধরিয়া বলিলেন, বিন্দু, আমাকে বাড়ি নিয়ে চল; মরতে হয় সেইখানেই মরব—এখানে ফেলবার লোক পাবে না।

এইবার বিন্দু দেখিল, মরণই নিশ্চিত; কেননা, অন্য উপায়ও নাই, স্বামীকে বাটী ফিরাইয়া লইয়া যাইবারও উপায় নাই। কিন্তু তাঁহাকে এ অবস্থায় রাখিয়া কেমন করিয়া মরিবে? আর যদি মরিতেই হয়, তখন লজ্জা করিয়া কি হইবে? অনেক বিতর্কের পর সে লজ্জার মাথা খাইয়া এ কথা কাশীনাথকে পত্রদ্বারা বিদিত করিল। পরের ঘটনা আপনাদের অবিদিত নাই।

আসিবার সময় কাশীনাথ অনেক টাকা আনিয়াছিল। সেই টাকা দিয়া শহরের উৎকৃষ্ট ডাক্তারদিগের মত জিজ্ঞাসা করায় সকলেই কহিল যে, বায়ু-পরিবর্তন না করিলে

আরোগ্য হইবে না। কাশীনাথ সকলকে লইয়া বৈদ্যনাথ উপস্থিত হইল। এখানে থাকিয়া মাস-দুয়ের মধ্যে সবাই বুঝিতে পারিল, যোগেশবাবু এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। তথাপি ফিরিবার সময় এখনও হয় নাই। সেই জন্য তাহাদিগকে এখানে রাখিয়া কাশীনাথ বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

প্রাতঃকালে কমলার সহিত দেখা হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলে?

রাত্রে এসেছি।

কমলা আপনার কর্মে চলিয়া গেল। কাশীনাথ বাহিরে আসিয়া কাছারি-ঘরে প্রবেশ করিল। বহুদিনের পর তাহাকে দেখিয়া কর্মচারীগণ দাঁড়াইয়া উঠিল; শুধু একজন সাহেবী পোশাক-পরা যুবক আপনার কাজে চেয়ারে বসিয়া রহিল। একজন আগন্তুককে দেখিয়া অপরাপর কর্মচারীরা যে সম্মান করিল, নব্যবাবু বোধ হয় তাহা দেখিতে পাইলেন না।

কাশীনাথ নিজে একটা কেদারা টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। এই লোকটি নূতন ম্যানেজার হইয়া আসিয়াছেন; নাম শ্রীবিজয়কিশোর দাস। কলিকাতায় বি. এ. পাস করিয়াছিলেন; এবং অতিশয় কর্মদক্ষ লোক, তাই উকিল বিনোদবাবু ইহাকেই ম্যানেজারী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ম্যনেজার অনেকক্ষণের পর কাশীনাথের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, মশাইয়ের কোনও প্রয়োজন আছে কি?

না, প্রয়োজন নাই, কাজকর্ম দেখছি মাত্র।

এবার দেওয়ান মহাশয় দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইনি আমাদের জামাইবাবু।

বিজয়বাবু গাত্রোত্থান করিয়া প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন। এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বিজয়বাবুকে কহিল, ভিতরে মা একবার আপনাকে ডাকছেন।

বিজয়বাবু প্রস্থান করিলে, কাশীনাথ ডাকিয়া কহিল, ইনি কে?

নূতন ম্যানেজার।

কে রাখলে?

মা রেখেছেন।

কেন?

বোধ হয় কাজকর্ম সুবিধামত হচ্ছিল না বলে।

এখন কোথায় গেলেন?

বাড়ির ভিতরে।

কাশীনাথ আর কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া ভিতরে আসিল। আসিবার সময় দেখিল, একটা ঘরের পর্দার সম্মুখে বিজয়বাবু দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাহার অন্তরাল হইতে আর একজন মৃদুস্বরে কথা কহিতেছেন। কাহার কথা কহিতেছে কাশীনাথ বুঝিতে পারিল, কিন্তু কোন কথা না কহিয়া, সে দিকে একবার না চাহিয়া আপন মনে চলিয়া গেল। দ্বিপ্রহরে কমলার সহিত আর একবার তাহার দেখা হইল।

কমলা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, শরীর ভাল আছে ত?

কাশীনাথ সেইরূপভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আছে।

আর কোন কথা না কহিয়া কমলা চলিয়া গেল। দাঁড়াইয়া কথাবার্তা, গল্প-গুজব করিবার সময় এখন আর তাহার নাই, এখন সহস্র কাজ

পড়িয়াছে; বিশেষতঃ নিজের বিষয় নিজের হাতে লইয়া তাহার আর নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় নাই।

একদিন সকালবেলা কাশীনাথ ম্যানেজারবাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইল। ভৃত্যমুখে ম্যানেজার জবাব দিলেন, এখন সময় নাই, সময় হলে আসব। কাশীনাথ তখন স্বয়ং কাছারিঘরে আসিয়া বিজয়বাবুকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিল, আপনার সময় নাই বলে আমি নিজে এসেছি। আজ আমার পাঁচ শত টাকার প্রয়োজন আছে; সময় হলে তা উপরে পাঠিয়ে দেবেন।

কি প্রয়োজন?

তা আপনার শুনবার প্রয়োজন নাই।

নাই সত্য। কিন্তু মালিকের অনুমতি বিনা কেমন করে দেব?

কাশীনাথ বুঝিল, কথাটা অন্য রকমের হইয়াছে। কহিল, আমার কথাই বোধ হয় যথেষ্ট। অন্য অনুমতির প্রয়োজন আছে?

বিজয়বাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন, আছে। যাকে তাকে টাকা দিতে নিষেধ আছে।

কাশীনাথ কমলার সহিত দেখা করিয়া কহিল, তোমার নূতন লোকটাকে তাড়িয়ে দাও।

কাকে?

যে তোমার ম্যানেজার হয়ে এসেছে।

কেন, তার দোষ কি?

আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি।

কি করেছে?

আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু না এসে—চাকরের মুখে বলে পাঠালে, আমার সময় নাই—যখন হবে তখন যাব।

কমলা সহাস্যে বলিল, হয়ত সময় ছিল না। সময় না থাকলে কেমন করে আসবে?

কাশীনাথ স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, বেশ, সময় ছিল না বলে যেন আসতে পারেনি, কিন্তু আমি নিজে গিয়ে যখন টাকা চাইলাম, তখন বললে যে মালিকের হুকুম ছাড়া দিতে পারি না।

কমলা মধুরতর হাসিয়া বলিল, কত টাকা চেয়েছিলে?

পাঁচ শ।

দিলে না?

না। তুমি আমায় টাকা দিতে কি নিষেধ করেছ?

হাঁ, যা তা করে টাকাগুলো উড়িয়ে দিতে আমার ইচ্ছা নাই।

কাশীনাথ—পাথরের কাশীনাথ হইলেও মর্মে পীড়া পাইল। এরূপ ব্যবহার বা এরূপ কথা সে পূর্বে আর শুনে নাই। বড় ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, আমাকে দেওয়া কি উড়িয়ে দেওয়া?

যেমন করেই হোক, নষ্ট করার নামই উড়িয়ে দেওয়া।

প্রয়োজনে ব্যয় করার নাম নষ্ট করা নয়।

কিসের প্রয়োজন?

একজনকে দিতে হবে।

দিতে ত হবে, কিন্তু পাবে কোথায়? নিজের থাকে ত দাও গে—আমি বারণ করব না।

কাশীনাথ চুপ করিয়া রহিল, কথাটা তাহার কানে অগ্নিশলাকার মত প্রবেশ করিল। বাহিরে আসিয়া সে আপনার ঘড়ি আংটি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া পাঁচ শত টাকা বৈদ্যনাথে পাঠাইয়া দিল। নীচে একস্থানে লিখিয়া দিল, আর কিছু চাসনে বোন, আমার আর কিছুই নেই।

সেইদিন হইতে কাশীনাথ আর ভিতরে প্রবেশ করে না; কমলাও কোনও খোঁজ লয় না। এমনই দিন-কতক গত হইবার পর একদিন একটা ভৃত্য আসিয়া কহিল, আপনার কাছে একজন ব্রাহ্মণ আসতে চান।

পরক্ষণেই কাশীনাথ বিস্মিত হইয়া দেখিল, একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হাতে পৈতা জড়াইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনি মহৎ ব্যক্তি, ব্রাহ্মণকে সর্বস্বান্ত করবেন না।

কাশীনাথ ভীত হইয়া কহিল, কি হয়েচে?

ব্রাহ্মণ কহিল, আপনার কত আছে, কিন্তু আমার ঐ জমিটুকু ভিন্ন অন্য উপায় নাই; ওটুকু আর নেবেন না। বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল।

কাশীনাথ ব্যস্ত হইয়া ব্রাহ্মণের হাত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সব কথা খুলে বলুন।

ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আপনি ধার্মিক ব্যক্তি, শপথ করে বলুন দেখি যে, ক্ষেত্রপালের দরুন জমিটা আমার নয়?

কে বলেচে আপনার নয়?

তবে বিজয়বাবু, আপনার নূতন ম্যানেজার, আমার নামে নালিশ করেচেন কেন?

নালিশ করেচে, আমি ত জানি না।

সমন দেখাইয়া ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিল, যখন মকদ্দমা হয়েচে, তখন মকদ্দমা করব এবং আপনাকে সাক্ষী মানব। আমি দরিদ্র, আপনার সঙ্গে বিবাদ সাজে না; তথাপি সর্বস্বান্ত হবার পূর্বে নিজের সম্পত্তি বিনা আপত্তিতে ছেড়ে দেব না।

ব্রাহ্মণ ক্রোধ করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া হাত ধরিয়া কাশীনাথ পুনর্বার তাঁহাকে বসাইয়া বলিল, যাতে ভাল হয়, সে চেষ্টা আমি করব; পরে আপনার যেমন ইচ্ছা সেরূপ করবেন।

কাশীনাথ ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া বিজয়বাবুকে ডাকিয়া বলিল, ও জমিটা আমাদের নয়, মিথ্যা ব্রাহ্মণকে ক্লেশ দিচ্চেন কেন?

মনিবের হুকুম।

কাশীনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, মনিব কি পরের জিনিস চুরি করতে শিখিয়ে দিয়েচে?

ওটা আমাদের জিনিস।

না, আপনাদের নয়।

বিজয়বাবু কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, আমি ভৃত্য মাত্র; যেরূপ আজ্ঞা হয়েচে, সেরূপই করেচি এবং করব।

এ কথা কমলাকে জানাইতে কাশীনাথের লজ্জা করিতেছিল; তথাপি বলিল, ও জমিটা তোমার নয়; ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব অপহরণ করো না।

অপহরণ করচি কে বললে?

যেই বলুক—ও জমিটা তোমার নয়। মিথ্যা মকদ্দমা করতে বিজয়বাবুকে নিষেধ করে দাও।

কমলা বিরক্ত হইয়া বলিল, বিজয়বাবু কাজের লোক, তিনি নিজের কাজ বুঝতে পারেন। তাঁর কাজে তোমার হাত দেবার প্রয়োজন নাই।

দিন-কয়েক পরে বিচারের দিন। সাক্ষী-মঞ্চে দাঁড়াইয়া কাশীনাথ কহিল, আমি স্বর্গীয় শ্বশুরমহাশয়ের সময় হতে বিষয় দেখে আসচি এবং পরে নিজেও বহুদিন তত্ত্বাবধান করেচি। আমি জানি, ও জমি কমলা দেবীর নয়।

বিজয়বাবু মকদ্দমা হারিয়া শুষ্কমুখে বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। অপর পক্ষ দুই হাত তুলিয়া কাশীনাথকে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিল।

.

নয়

পর্দার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিজয়বাবু মকদ্দমার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া সর্বশেষে নিজের টীকা-টিপ্পনি ও মতামত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কেবল জামাইবাবুর জন্য আমরা এ মকদ্দমা হেরে গেলাম। তখন পর্দার অন্তরালে একগুণ কমলা দশগুণ হইয়া ফুলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ভিতর হইতে কমলা কহিল, আপনি ভিতরে আসুন, অনেক কথা আছে। বিজয়বাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দুইজনে বহুক্ষণ মৃদু মৃদু কথা হইল, তাহার পর বিজয়বাবু বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

আজ বহুদিনের পরে কাশীনাথের আহার করিবার সময় কমলা আসিয়া বসিল। এখন আর তাহার পূর্বের উগ্রমূর্তি নাই, বরং সম্পূর্ণ শান্ত ও স্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে কমলা কহিল, ঘরভেদী বিভীষণের জন্য সোনার লঙ্কাপুরী ছাই হয়ে গিয়েছিল—জান?

আহার করিতে করিতে কাশীনাথ কহিল, জানি।

কমলা কহিল, জানবে বৈ কি! সেও ত পরের অন্নেই মানুষ কিনা!

কাশীনাথ কোন কথা কহিল না।

কমলা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল, তাই ভাবি, যে চিরকাল পরের খেয়ে মানুষ—এখনও যাকে পরের না খেলে উপোস করতে হয়, তার সত্য কথা বলবার শখই বা কেন, আর এত অহঙ্কারই বা কেন?

কাশীনাথ নিঃশব্দে একটির পর একটি করিয়া গ্রাস মুখে তুলিতে লাগিল।

যার খায়, তার গলায় ছুরি দিতে কসাইয়ের মনেও দয়া হয়।

কমলা!

যে স্ত্রীর অন্নে প্রতিপালিত, তার তেজ শোভা পায় না। তোমার দিন দিন যেরকম ব্যবহার হচ্ছে, তাতে চক্ষুলজ্জা না থাকলে—

কাশীনাথ হাসিয়া বলিল, বাড়ি থেকে দূর করে দিতে!

দিতামই ত।

অর্ধভুক্ত অন্ন ঠেলিয়া রাখিয়া কাশীনাথ কমলার প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া বলিল, কমলা! আমি পূর্বে কখনও রাগ করি নাই, কখনও তোমায় রূঢ় কথা বলি নাই; কিন্তু তুমি যা বললে, তা পূর্বে বোধ হয় আর কেউ বলে নাই।আজ হতে তোমার অন্ন আর খাব না। দেখ, যদি এতে সুখী হতে পার।

কাশীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

কমলাও সগর্বে দাঁড়াইয়া কহিল, যদি সত্যবাদী হও, যদি মানুষ হও, তা হলে আপনার কথা রাখবে।

তা রাখব। কিন্তু তুমি যে-কথা বললে, তা তোমারই চিরশত্রু হয়ে রইল। আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু জগদীশ্বর তোমাকে কি ক্ষমা করবেন?

কমলা আরও জ্বলিয়া উঠিল—তোমার শাপে আমার কিছুই হবে না।

তাই হোক। ভগবান জানেন, আমি তোমাকে শাপ দিই নাই, বরং আশীর্বাদ করচি—ধর্মে মতি রেখে সুখী হও।

বাহিরে আসিয়া কাশীনাথ ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি—সমস্ত একে একে ছিন্ন করিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিল, ভৃত্যবর্গকে ডাকিয়া নিজের যাহা কিছু ছিল, বিলাইয়া দিল। তাহার পর রাত্রে কমলার কক্ষদ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল, কমলা! কমলা জাগিয়া ছিল, কিন্তু উত্তর দিল না। দ্বার খোলা ছিল, কাশীনাথ ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চোখ বুজিয়া কমলা শয্যায় পড়িয়া আছে। কাছে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া কাশীনাথ আবার ডাকিল, কমলা! কোন উত্তর নাই। যাবার সময় আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, বলিয়া কাশীনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কাশীনাথ প্রস্থান করিলে, কমলা শয্যা ত্যাগ করিয়া জানালায় আসিয়া বসিল। বসিয়া বসিয়া প্রভাত হয় দেখিয়া সে আবার শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন কমলা দেখিল, বেলা হইয়াছে এবং বাড়িময় বিষম হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ জাগরিত হইবার পূর্বেই একজন দাসী ছুটিয়া আসিয়া চিৎকার করিয়া কহিল, সর্বনাশ হয়েচে মা, জামাইবাবু খুন হয়েচেন।

কাহারও অঙ্গে এক কটাহ জ্বলন্ত তৈল নিক্ষেপ করিলে সে যেমন করিয়া উঠে, কমলাও তেমনি করিতে করিতে নীচে আসিয়া কহিল, একেবারে খুন হয়ে গেছে?

কে একজন জবাব দিল, একেবারে।

বিবসনা-প্রায় কমলা যখন বাহিরের ঘরে আসিয়া পড়িল, তখন রক্তসিক্ত চৈতন্যহীন কাশীনাথ একটা সোফার উপর পড়িয়া ছিল, সমস্ত অঙ্গে ধূলা ও রক্ত জমাট বাঁধিয়া আছে;

নাক, মুখ, চোখ দিয়া অজস্র রক্ত নির্গত হইয়া সেইখানে শুকাইয়া চাপ বাঁধিয়া গিয়াছে। চিৎকার করিয়া কমলা মাটির উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

সমস্ত গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, জমিদার-জামাইবাবু অন্ধকার রাত্রে একা কোথায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে খুন হইয়া গিয়াছেন।

দুইদিন পরে কাশীনাথের জ্ঞান হইলে, পুলিশের সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, বাবু। কে এমন করেছে?

কাশীনাথ উপরপানে চাহিয়া বলিল, উনি করেচেন।

বৃদ্ধ নায়েব সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সাহেব আবার বলিল, বাবু, তাদের কি আপনি চিনতে পারেন নাই?

কাশীনাথ অস্ফুটে কহিল, হাঁ।

সাহেব ব্যগ্র হইয়া কহিল, কে তারা?

কাশীনাথ একটু মৌন থাকিয়া কহিল, আমি ভুল বলেচি। তাদের চিনতে পারি নাই।

সাহেব আরও বার-দুই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিল, কিন্তু কোন ফল হইল না।

কাশীনাথ আর দ্বিতীয় কথা কহিল না। পরদিন নায়েবকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, বৈদ্যনাথে আমার ভগিনী বিন্দুবাসিনী আছে, তাকে একবার দেখব; আপনি আনতে লোক পাঠান।

তিনদিন পরে বিন্দুবাসিনী ও যোগেশবাবু আসিয়া পড়িলেন। বিন্দু শক্ত মেয়ে, সে কমলার মত নহে; তাই চিৎকারও করিল না, মূর্চ্ছাও গেল না। শুধু চোখের জল মুছিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল, কাশীদাদা, কে এমন করেছে?

কেমন করে জানব?

কারও ওপর সন্দেহ হয় কি?

সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না বোন।

বিন্দু চুপ করিয়া কাশীনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সকলেই জানিত, কাশীনাথ এ আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। মৃত্যু যেন ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। আজ অনেক রাত্রে জ্বরের প্রকোপে ছটফট করিতে করিতে কাশীনাথ চিৎকার করিয়া উঠিল, বল কমলা, এ কাজ তুমি করনি?

বিন্দু কাছে আসিয়া দাদার মুখের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বলচ দাদা?

কাশীনাথ বিন্দুকে কমলা ভ্রম করিয়া দুই হাত বাড়াইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া করুণকণ্ঠে আবার বলিল, আমি মরেও সুখ পাব না কমলা। শুধু একবার বল, এমন কাজ তোমার দ্বারা হয়নি?

.

দশ

জ্ঞানে, অজ্ঞানে, তন্দ্রায় আচ্ছন্নের মত কমলার দুইদিন কাটিয়া গেল। তাহার জন্য ডাক্তারের মনে মনে আশঙ্কা ছিল, তাই তাঁহার উপদেশে অত্যন্ত সতর্কভাবে তাহাকে

সকলে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। আজ দুইদিন অবিশ্রাম চেষ্টা-শুশ্রূষায় সন্ধ্যার পরে তাহাকে সচেতন করিয়া উঠাইয়া বসাইল।

ভাল করিয়া চোখ চাহিয়া কমলা দেখিল, যে এতক্ষণ তাহার মাথা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে সম্পূর্ণ অপরিচিতা। জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে?

অপরিচিতা কহিল, আমি বিন্দু, তোমার স্বামীর ভগিনী।

কমলা বহুক্ষণ পর্যন্ত নীরবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে হাত নাড়িয়া ঘরের সমস্ত লোককে বাহির করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি কতক্ষণ এমন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি ঠাকুরঝি?

বিন্দু কহিল, পরশু সকালে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে বৌ, এর মধ্যে আর ত তোমার হুঁশ হয়নি।

পরশু! কমলা একবার চমকাইয়া উঠিয়াই স্থির হইল। তাহার পরে মাথা হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহার কোনপ্রকার সাড়া না পাইয়া বিন্দু শঙ্কিত-চিত্তে তাহার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া ডাকিল, বৌ!

কমলা মুখ তুলিল না, কিন্তু সাড়া দিল। কহিল, ভয় ক'রো না ঠাকুরঝি, আমি আর অজ্ঞান হব না।

সে যে অন্তরের মধ্যে আপনাকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য নিঃশব্দে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, বিন্দু তাহা বুঝিল। তাই সেও ধৈর্য ধরিয়া মৌন হইয়া রহিল।

আরও কিছুক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকিয়া কমলা কথা কহিল; বলিল, তুমি যে আমাকে নিয়ে এই দু'দিন বসে আছ ঠাকুরঝি, আমার সেবা করতে কি করে তোমার প্রবৃত্তি হ'ল? আমি নিজে ত কখন এমন করতে পারতাম না!

বিন্দু কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কেন প্রবৃত্তি হবে না বৌ, তুমি ত আমার পর নও! আমাদের পরিচয় নেই বটে কিন্তু দাদার মত তুমিও আমার আপনার। তাঁর মত তোমার সেবা করাও ত আমার কাজ। বৌ, তুমি জান না, কিন্তু এসে পর্যন্ত আমার কি করে যে দিন কেটেচে, সে ভগবানই জানেন। একবার দাদার ঘর, আর একবার তোমার ঘর। তাঁর কাছে যখন যাই তখন তোমার জন্য প্রাণ ছটফট করে, আবার তোমার কাছে এসে বসলে তাঁর জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি। বিকেলবেলা থেকে তিনি একটু সুস্থ হয়ে ঘুমুচ্ছেন দেখে তোমার কাছে স্থির হয়ে বসতে পেরেছিলাম। এ-যাত্রা দাদা রক্ষে পাবেন, এ আশাই ত কারো ছিল না বৌ।

কমলা বলিয়া উঠিল, বেঁচে আছেন?

বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বেঁচে আছেন বৈ কি। ডাক্তার বললেন, আর ভয় নেই; জ্বর কমে গেছে।

কমলার মুখখানি অকস্মাৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াই তাহা মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। একবার তাহার আপাদমস্তক থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই সংজ্ঞা হারাইয়া বিন্দুর কোলের উপর ঢলিয়া পড়িল।

বিন্দু চেঁচামেচি করিয়া কাহাকেও ডাকিল না—তাহার মাথা কোলে করিয়া বসিয়া নিঃশব্দে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। এই মেয়েটির স্বাভাবিক ধৈর্য যে কত বড়, সে পরীক্ষা তাহার স্বামীর পীড়ার সময়েই হইয়া গিয়াছিল। মৃত্যু যাহার স্বামীর শিয়রে আসিয়া বসিয়াও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, এখন কমলার জন্যও সে অস্থির হইয়া উঠিল না। কিছুক্ষণে সংজ্ঞা পাইয়া কমলা চোখ মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিল, সে কোথায় আছে;

তাহার পর সেই কোলের উপরেই উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রাণপণে নিজের বুক চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে ক্রন্দন এত গাঢ়, এত গুরুভার যে, তাহা বিন্দুর ক্রোড়ের মধ্যেই শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। তাহার একবিন্দু তরঙ্গও ঘরের বাহিরে কাহারও কানে পৌঁছিল না। নির্জন বাহিরে রাত্রির আঁধার নিঃশব্দে গাঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল, শুধু এই স্বল্পালোকিত কক্ষের মধ্যে এই দুটি তরুণী রমণী, একজন তাহার বিদীর্ণ বক্ষের সমস্ত জ্বালা আর একজনের গভীর-শান্ত ক্রোড়ের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিল।

ক্রমশঃ শান্ত হইয়া কমলা স্বামীর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেন যে নিজে গিয়া তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল না, তাহা বিন্দু কিছুতেই ভাবিয়া পায় নাই। একবার এমনও ভাবিবার চেষ্টা করিয়াছিল, হয়ত বড়লোকদের এমনই শিক্ষা এবং সংস্কার। সেবা-শুশ্রূষার ভার চাকর-দাসীদের উপর দিয়া বাহির হইতে খবর লওয়াই তাহাদের নিয়ম।

হঠাৎ কমলা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ঠাকুরঝি, তোমার দাদার জ্ঞান হলে আমাকে কি একবারও খোঁজ করেননি?

একবার করেছিলেন, বলিয়াই বিন্দু হঠাৎ থামিয়া গেল? কমলা তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু প্রশ্ন না করিয়া শুধু উৎসুক ব্যাকুল-দৃষ্টিতে বিন্দুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বিন্দু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দাদার জ্ঞান হলে তিনি আমাকে তুমি মনে করে গলা ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—বল কমলা, এ-কাজ তুমি করনি? আমি মরেও সুখ পাব না কমলা, শুধু একবার বল, এ-কাজ তোমার দ্বারা হয়নি?

কমলা নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল, তার পরে?

বিন্দু কহিল, আমি ত জানিনে বৌ, তিনি কোন্ কথা জানতে চেয়েছিলেন।

আমি জানি ঠাকুরঝি, তিনি কি জানতে চান, বলিয়া কমলা একেবারে সোজা উঠিয়া বসিল।

বিন্দু কমলার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি সে ঘরে যেয়ো না বৌ।

কেন যাব না?

ডাক্তার নিষেধ করেছিলেন, তুমি গেলে ক্ষতি হতে পারে।

আমার ক্ষতি আমার চেয়ে ডাক্তার বেশি বোঝে না ঠাকুরঝি, আমি তাঁর কাছেই চললুম; ঘুম ভেঙ্গে আবার যদি জানতে চান, আমাকে ত তার জবাব দিতে হবে? বলিয়া কমলা বিন্দুর হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া বিনীত-কণ্ঠে কহিল, আমি মাথা সোজা রেখে চলতে পারব না বোন, আমাকে দয়া করে একবার তাঁর কাছে দিয়ে এস ঠাকুরঝি।

মনে মনে কহিল, ভগবান, হাতের নোয়া যদি এখনো বজায় রেখেচ ঠাকুর, তা হলে সত্যি-মিথ্যের বিচার করে আর তা কেড়ে নিয়ো না। দণ্ড আমার গেছে কোথায়—সে ত সমস্তই তোলা রইল। শুধু এই করো প্রভু, তোমার সমস্ত কঠিন শাস্তি যাতে হাসিমুখে মাথায় তুলে নিতে পারি, আমার সেই পথটুকু ঘুচিয়ে দিয়ো না।

স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া কমলা কিছুতেই আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না। তাহার দুইদিনের উপবাসক্ষীণ দেহ ও ততোধিক দুর্বল মস্তিষ্ক ঘুরিয়া স্বামীর পদতলে পড়িয়া গেল।

কাশীনাথ জাগিয়া ছিল; কে একজন তাহার পায়ের কাছে বিছানার উপর পড়িল, তাহা সে টের পাইল, কিন্তু ঘাড় তুলিয়া দেখিবার সাধ্য ছিল না, তাই জিজ্ঞাসা করিল, কে, বিন্দু?

বিন্দু বলিল, না দাদা, বৌ।

কমলা? তুমি এখানে কেন?

বিন্দু জবাব দিল। শিয়রে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, সামলাতে না পেরে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে দাদা।

কাশীনাথ চুপ করিয়া রহিল। বিন্দু পুনরায় কহিল, আজ রাত্রে আসতে আমি মানা করেছিলাম। আমি নিশ্চয় জানতাম, দু'দিনের পরে এইমাত্র যার জ্ঞান হয়েচে, সে কিছুতেই এ ঘরে ঢুকে নিজেকে সামলে রাখতে পারবে না।

স্বামীর দুই পায়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কমলা নীরবে পড়িয়া ছিল, তাহার অবিচ্ছিন্ন তপ্ত অশ্রুর ধারা কাশীনাথ নিজে আপনার শীতল পায়ের উপরে অনুভব করিতেছিল; তাই ধীরে ধীরে কহিল, হাঁ বোন, না এলেই তার ভাল ছিল।

কমলার প্রতি চাহিয়া বিন্দুর নিজের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, আঁচলে মুছিতে মুছিতে বলিল, সে ভাল কি কেউ পারে দাদা? তুমি ভাল হয়ে ওঠো, কিন্তু এই দুটো দিন বৌয়ের যে কেমন করে কেটেচে সে আমি জানি আর ভগবান জানেন; নিজেও বোধ করি জানে না।

ভগবানের নামে কাশীনাথ চোখ বুজিয়া তাহার বাহিরের দৃষ্টি নিমেষের মধ্যে ফিরাইয়া অন্তরের দিকে প্রেরণ করিল। যেখানে বিশ্বের সমস্ত নরনারীর অন্তর্যামী চিরদিন অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার শ্রীচরণে যেন এই প্রশ্ন নিবেদন করিয়া দিয়া সে মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল, তাহার পর চোখ চাহিয়া কহিল, আমার প্রাণের আর কোন আশঙ্কা নেই কমলা, উঠে ব'সো–

বিন্দু কহিল, দাদা, তুমি আমার কাছে যে-কথা জানতে চেয়েছিলে, বৌ তার উত্তর দিতে এসেচে।

কাশীনাথের পাংশু ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল; কহিল, আর কারুকে কোন জবাব দিতে হবে না বিন্দু, যে দু'দিন ও অচেতন হয়ে পড়েছিল, তার মধ্যে আমার সমস্ত জবাব

পৌঁছে গেছে। বলিয়া বাঁ হাতে ভর দিয়া কাশীনাথ উঠিয়া বসিল। ডান হাতে কমলার মাথাটি জোর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া ডাকিল, কমল!

কমলা সাড়া দিল না, তেমনি সজোরে পায়ের উপর মুখ চাপিয়া পড়িয়া রহিল, তেমনি তাহার দু'চক্ষু বাহিয়া প্রস্রবণ বহিতে লাগিল।

বিন্দু ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তুমি উঠো না দাদা, ডাক্তার বলেন, আবার যদি–

কাশীনাথ হাসিমুখে কহিল, ডাক্তার যাই বলুন বোন, আমি তোদের বলচি, আর ভয় নেই, এ যাত্রা আমাকে তোরা ফিরিয়ে এনেচিস।

তার পরে কমলার রুক্ষ চুলগুলি হাতের মধ্যে লইয়া ক্ষণকাল নীরবে নাড়াচাড়া করিয়া কাশীনাথ পুনরায় শুইয়া পড়িল।